পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : যে এলাকায় পুকুরের পানি প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা যায়, সে এলাকায় গ্রীন হাউজ পদ্ধতিতে আগাম পরিপক্ক গলদা চিংড়ি উৎপাদনের পুকুর নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, গ্রীন হাউজ পুকুরের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক, যেখানে সার্বক্ষণিক সূর্য্যের আলো পাওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ পুকুরের আকৃতি আয়তাকার এবং আয়তন ১৮০-২০০ বর্গমিটার হলে গ্রীন হাউজ তৈরী এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়।

গ্রীন হাউজ তৈরি : শীত মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পুকুরের পানির তাপমাত্রা গলদা চিংড়ির ডিম্বাশয় পরিপক্কতার সহায়ক মাত্রায় (২৮-৩২° সে.) রাখার জন্য পুকুরের উপরে গ্রীন হাউজ তৈরী করা হয়। এ ধরণের হাউজ তৈরীর জন্য প্রথমে বাঁশের চাটাই দিয়ে দোচালাকৃতি ফ্রেম তৈরী করা হয়। এই ফ্রেমের উপরে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হয় যাতে কোথাও কোন ফাঁক না থকে এবং প্রয়োজনে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য দু'পাশে কিয়দাংশ খুলে দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। দোচালার ফ্রেম এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যাতে দুই চালের মাঝ বরাবর পুকুরের পানি হতে চালার দূরত্ব ১৮০-২০০ সেমি. থাকে। এতে গ্রীন হাউজের ভিতরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। পলিথিনের পুরুত্ব ০.৪-০.৫ মিমি. হলে নির্দিষ্ট তাত্রায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়। অধিক পুরু পলিথিন ব্যবহারের ফলে তাপমাত্রার অতি বৃদ্ধিতে চিংড়ির পীড়ন হতে পারে। পলিথিন যাতে বাতাসে উড়তে না পারে সেজন্য একটি বাঁশের চাটার তৈরী ফ্রেম পলিথিনের উপরে স্থাপন করা যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতি : পুকুরের তলা হতে ৬-৮ সেমি. এর বেশী কাদা তুলে ফেলে, প্রতি ১০০ বর্গমিটারে ২৫০ গ্রাম হারে পাথুরে চুন ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এরপর পুকুরে ১.০-১.৫ মিার উচ্চতা পর্যন্ত পানি সরবরাহ করে ২৫ পিপিএম হারে ডলো চুন প্রয়োগ করতে হবে। পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য অপর্যাপ্ত হলে ২.০-২.৫ পিপিএম হারে ইউরিয়া এবং ২.৫-৩.০ পিপিএম হারে টিএসপি সার প্রয়োগ করা যোতে পারে। চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য পুকুরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ২/৩ স্থানে ঝোঁপ তৈরী করা যেতে পারে, যা চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

চিংড়ি মজুদ : নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে যখন সাধারণতঃ পুকুরের পানির তাপমাত্রা কমতে শুরু করে তখনই গ্রীন হাউজযুক্ত পুকুরে চিংড়ি মজুদ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ২০টি হারে বাছাইকৃত সুস্থ সবল স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি ৫:১ অনুপাতে পুকুরে মজুদ করতে হবে। প্রতিটি স্ত্রী চিংড়ির ওজন ৬০-৮০ গ্রাম এবং পুরুষ চিংড়ির ওজন ১০০-১২০ গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী চিংড়ির ওজন যত বেশী হবে তত ডিমের পরিমাণ ও বাজার মূল্য বেশী হবে। মজুদকৃত পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় চলন পদ যাতে নীল ও লম্বা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, এ ধরণের পুরুষ চিংড়ি প্রজনন প্রক্রিয়ায় অধিকতর সক্রিয় থাকে।

খাদ্য সরবরাহ : গলদা চিংড়ির ব্রুড তৈরীর জন্য ৪৫% আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মোট মজুদকৃত চিংড়ির ওজনের ৩-৪% হারে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতি কেজি চিংড়ির খাদ্যে ১-২ মিলি. হারে কড লিভার তৈল মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ডিম পরিপক্কতা ত্বরান্বিত হতে সহায়ক হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা : গ্রীন হাউজ পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড উন্নয়নে পুকুরের পানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য পুকুরে সার্বক্ষণিক একটি থার্মোমিটার ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং সকাল-দুপুর-বিকাল পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। কোন কারণে যদি পানির তাপমাত্রা ৩২° সে. এর বেশী হয়ে যায় তাহলে পলিথিনের কিয়দংশ খুলে দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। পি-এইচসহ পানির অন্যান্য গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় রাখার জন্য প্রতি পনের দিন অন্তর পানিতে ১০-১৫ পিপিএম হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা যদি ৩০ সেমি. এর চেয়ে কমে যায় তাহলে পুকুরের ১০-১৫% পানি পরিস্কার স্বাদু বা অল্প লোনা (২-৩ পিপিটি) পানি দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। অধিক লবণাক্ত পানি চিংড়ির পরিপক্কতায় বিলম্ব ঘটাতে পারে। এ ছাড়া প্রতি পনের দিন অন্তর পানিতে চুন প্রয়োগের পূর্বে কিছু পানি পরিবর্তন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে কোনভাবেই একবারে ১০% এর বেশী পানি পরিবর্তন করা উচিত হবে না। এতে তাপমাত্রার অধিক তারতম্য হয়ে চিংড়ির পীড়ন হতে পারে। চিংড়ির গায়ে কালো দাগ বা শ্যাওলা পরিলক্ষিত হলে, প্রতি ১০০ বর্গমিটারে ৩৫০-৪০০ গ্রাম হারে জিওলাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে স্বাভাবিক যে কোন পুকুরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে শেষ সপ্তাহে কিংবা মার্চের প্রথম সপ্তাহে গ্রীন হাউজ পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, গ্রীন হাউজের পলিথিনের ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে।

চিংড়ির পরিপক্কতা পরীক্ষা : মজুদের পনের দিন পর থেকে প্রতি সাত দিন অন্তর ঝাঁকি জাল টেনে চিংড়ির পরিপক্কতা পরীক্ষা করতে হবে। চিংড়ির পেটে কমলা বংয়ের ডিম পরিলক্ষিত হলেই সে চিংড়ি ধরে পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ শীত মৌসুমে পুকুরে গ্রীন হাউজ পদ্ধতিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির প্রজননক্ষম ব্রুড উৎপাদন করা সম্ভব।

মাঠ পর্যায়ে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত খোলা পুকুরে কোন চিংড়ির পেটে ডিম আসেনি কিংবা ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয়নি। অন্যদিকে, গ্রীন হাউজ পুকুরে জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে চিংড়ির ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয়ে মাথা লাল হতে শুরু করে এবং ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে চিংড়ির পেটে ডিম আসতে শুরু করে।

রচনায় : ড. এসবি সাহা ও মো: মনিরুজ্জামান
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি:
প্রকাশ সংখ্যা : ২৫,০০০ কপি
প্রকাশনা স্বত্ব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
প্রকাশক : উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
ফোন : ৯৫৮২১৬২, ফ্যাক্স : ৯৫৫৬৭৫৭
ই-মেইল : flidmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.flid.gov.bd
মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ, পল্টন, ঢাকা-১০০০

বিপন্ন প্রজাতির ফলি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

এবং

গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড উন্নয়ন কৌশল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিপন্ন প্রজাতির ফলি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

ভূমিকা :

মাছে-ভাতে বাঙ্গালী একটি প্রাচীনতম প্রবাদ। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন অব্যবস্থাপনায় (অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, ধান ক্ষেতে কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, নির্বিচারে মাছ আহরণে, প্রজননকালে অনুকূল তাপমাত্রার ব্যতয়, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ ইত্যাদি) জলজ পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিলে মাছের প্রাচুর্যতা ব্যপকহারে হ্রাস পেয়েছে। দিন দিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে অনেক প্রজাতির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় প্রজাতির মাছের বৃদ্ধি হার বিদেশী মাছের তুলনায় কম হওয়ায় অধিক মুণাফার আশায় চাষীরা বিদেশী মাছ চাষে বেশী উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সুস্বাদু দেশী মাছগুলো বিপন্নতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষার জন্য কৃত্রিম প্রজননের পাশাপাশি প্রয়োজন দেশীয় সহজলভ্য উপাদানে তৈরী মৎস্য খাদ্য প্রয়োগ করে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ বৃদ্ধি করা। আশার কথা ইদানিং বিপন্ন প্রজাতির মাছ চাষে চাষী ও উদ্যোক্তাদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশীয় প্রজাতির মাছের মধ্যে পাবদা, গুলশা, মেনি, কৈ, শিং, মাগুর, দেশীপুটি, মহাশোল, ভাগনা, চিতল ও কুচিয়া মাছের কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ফলি একটি সুস্বাদ দেশীয় প্রজাতির মাছ। ফলি মাছ লম্বায় ৬০ সেমি. পর্যন্ত হতে পারে। প্রকৃতিতে ফলি মাছ আজ বিপন্নপ্রায়। অতি আহরণ, রাক্ষুসে স্বভাব, আবাসস্থল বিনষ্ট এবং ডিম ধারণ ক্ষমতা কম বিধায় ফলি মাছ আজ বিলুপ্তির পথে। রাক্ষুসে স্বভাবের হলেও সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে বিধায় ফলি মাছ চাষযোগ্য। ফলি মাছ রক্ষার প্রধানতম উপায় হলো এ মাছের ব্রুড ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা। পাশাপাশি এর চাষ কৌশল উদ্ভাবন করে চাষী পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

ফলি মাছের কৃত্রিম প্রজনন :

কৃত্রিম প্রজননের জন্য ডিমের পরিপক্কতার সময় জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। গোনাড হিস্টোলজী ও জিএসআই পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ফলি মাছ মে-জুন মাসে প্রজনন করে থাকে। প্রকৃতিতে এরা জলজ আগাছা অর্থাৎ ঘাস ও লতাপাতার উপর ডিম দিয়ে থাকে। ফলে প্রাকৃতিক উৎস থেকে একসাথে অধিক পোনা বা ডিম সংগ্রহ করা কঠিন। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা প্রতিকূলতায় পোনার বেঁচে থাকার হার কম। স্বভোজি বা ক্যানাবলিজম বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিজেরাই নিজেদের পোনা ভক্ষণ করে থাকে। পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করে পোনা প্রতিপালন করলে ক্যানাবলিজম বৈশিষ্ট্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

প্রজননক্ষম মাছ সনাক্তকরণ :

স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে সনাক্ত করার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পৃষ্টপাখনার সাথে সংযুক্ত কাঁটা। প্রজননক্ষম পুরুষ এবং স্ত্রী মাছ সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো :

বৈশিষ্ট্য	পুরুষ মাছ	স্ত্রী মাছ
আকার	অপেক্ষকৃত বড়	তুলনামূলকভাবে ছোট
জননাঙ্গ	সরু ও লালচে বর্ণের জননাঙ্গ, শ্রোণী পাখনা (Pelvic Fin) অপেক্ষা বড়	বৃহৎ ও সাদাটে জননাঙ্গ, শ্রোণী পাখনা (Pelvic Fin) অপেক্ষা ছোট
পৃষ্টপাখনার সংযুক্ত কাঁটা	পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে এই কাঁটা তুলনামূলকভাবে বড় হয়ে থাকে	স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে এই কাঁটা ছোট হয়ে থাকে।

পোনা উৎপাদন কৌশল :

কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রজনন মৌসুমের শুরুতে স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে ভিন্ন ভিন্ন পুকুরে মজুদ করতে হবে। দেহ ওজনের ৫-৩% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ওপর ফলি মাছের প্রজনন অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণতঃ মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত এই মাছ প্রজনন করে থাকলেও জুন মাসের মাঝামাঝি হলো সর্বোচ্চ প্রজননকাল। প্রজনন মৌসুমে মাছ পরীক্ষা করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বাচন করতে হবে। প্রথমত জননাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে সনাক্ত করতে হবে। পাশাপাশি প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী মাছের পেট পরিপক্ক ডিমের জন্য ফোলা থাকে ও নরম থাকে। পেটের দুইপাশ অনেকটা সুপারির আকার ধারণ করে। কৃত্রিম প্রজননের জন্য পুরুষ এবং স্ত্রী ফলি মাছের পৃষ্টপাখনার নীচে পিজি দ্রবণের ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। নিম্নের ছকে পিজি দ্রবণ প্রয়োগের পরিমান, Ovulation Time, নিষিক্ত ডিমের হার, প্রস্ফুটনের সময়, প্রস্ফুটনের হার এবং ডিম্বথলি নিঃশেষিত হওয়ার সময় উল্লেখ করা হলো :

লিঙ্গ	পিজি দ্রবণের পরিমান/প্রতি কেজি মাছ	Ovulation Time	নিষিক্ত ডিমের হার (Fertilization Rate)	পরিস্ফুটনের সময় (Hatching Time)	পরিস্ফুটনের হার (Hatching Rate)	ডিম্বথলি নিঃশেষিত হওয়ার সময় (Yolk sac absorption period)
পুরুষ	২.৫ মি.গ্রা.	১৮-২০ ঘন্টা	৫৫-৭০%	৩-৪ দিন	৩৫-৫৬%	৪-৫ দিন
স্ত্রী	৪ মি.গ্রা.	১৮-২০ ঘন্টা	৫৫-৭০%	৩-৪ দিন	৩৫-৫৬%	৪-৫ দিন

পিজি দ্রবণের ইনজেকশন প্রয়োগের ২৪ ঘন্টা পর পুরুষ মাছকে কেটে গোনাড সংগ্রহ করে টুকরা টুকরা কেটে ০.৮% লবণ দ্রবণে মিশিয়ে শুক্রাণুর দ্রবণ তৈরী করা হয়। অতপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্ত্রী মাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করে শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করা হয়। তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে নিষিক্ত ডিম থেকে ৩-৪ দিন পর রেণু পোনা বের হয়। পরবর্তীতে ২-৩ দিন পর Incubation জার থেকে রেণু পোনাগুলো সরিয়ে ট্রেতে নেওয়া হয় এবং সেখানে ১৫ দিন লালন করা হয়। ডিম প্রস্ফুটনের ৪-৫ দিন পর ডিম্বথলি নিঃশেষিত হওয়ার পর রেণু পোনাকে প্রতিদিন চারবার (৬ ঘন্টা পর পর) সেদ্ধ ডিমের কুসুম ৪-৫ দিন পর্যন্ত খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করতে হবে।

হাপায় ফলি মাছের নার্সিং ব্যবস্থাপনা :

পুকুরে দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট এবং প্রস্থে ৩ ফুট আকারের ফিল্টার নেটের হাপা ৪টি বাঁশের খুটিতে স্থাপন করে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর উৎপাদিত ফলি মাছের রেণু পোনাকে পুকুরে স্থাপিত হাপায় প্রতিপালন করতে হবে। প্রতি ঘনমিটারে হাপা প্রতি ৫-৭ দিন বয়সী ৩০০-৫০০টি রেণু পোনা মজুদ করা যায়। খাদ্য হিসেবে ক্ষুদ্র প্রাণিকণা, জীবিত যে কোন মাছের রেণু সরবরাহ করতে হবে। খাবার নিশ্চিতকরণের জন্য যে কোন মাছের রেণু পোনা অধিক ঘনত্বে মজুদ করতে হবে। পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা হলে পোনার বেঁচে থাকার হার ৯০%। সপ্তাহে ১ দিন হাপা পরিস্কার করে দিতে হবে। খাদ্য সরবরাহ ঠিক থাকলে ১৫ দিনে মাছ ১-১.২৫ ইঞ্চিতে পরিণত হয় এবং এই সময় মাছের গায়ে জেব্রার মতো দাগ ফুটে উঠে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পোনার শরীর থেকে এই দাগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। রেণু পোনার আকার ২-৩ ইঞ্চি না হওয়া পর্যন্ত লালন করতে হবে এবং পরবর্তীতে নার্সারী পুকুরে স্থানান্তর করতে হবে।

রচনায় : ড. ডুরিন আখতার জাহান, জোনায়রা রশিদ ও ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

গলদা চিংড়ির আগাম ব্রুড উন্নয়ন কৌশল

ভূমিকা : চিংড়ি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি পণ্য। চাষের মাধ্যমে সাধারণতঃ দু'ধরণের চিংড়ি উৎপাদন করা হয়। একটি বাগদা (Penaeus monodon) এবং অন্যটি গলদা (Macrobrachium rosenbergii) চিংড়ি। বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে এবং গলদা চিংড়ি স্বাদু কিংবা অল্প লবণাক্ত পানিতে চাষ করা হয়। দেশে বিদ্যমান বিস্তৃত চাষযোগ্য বাৎসরিক ও মৌসুমি স্বাদুপানির জলাশয় এবং ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিবেচনায় দেশে বাণিজ্যিকভাবে গলদা চিংড়ি চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। গলদা চিংড়ির প্রজনন, পোনা উৎপাদন কৌশল এবং চাষ প্রযুক্তি মোটামুটি সহজলভ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে এ চিংড়ির চাহিদাও যথেষ্ট। গলদা চাষের প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে চাষ পুকুরে সময়মত মজুদের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অপ্রাপ্যতা অন্যতম।

গলদা চিংড়ির চাষের সময় তুলনামূলকভাবে বেশি (৬-৮ মাস)। সাধারণত মার্চের শেষ হতে এপ্রিল মাসে গলদার ব্রুড সহজ প্রাপ্য হয় এবং এরপর পোনা তৈরীতে প্রায় ৪০ দিন সময় লেগে যায়। এতে চাষীদের কাছে গলদার পোনা মে মাসের শেষ নাগাদ সহজ প্রাপ্য হয় এবং পোনা হতে বাজারজাত উপযোগী চিংড়ি তৈরীর জন্য ৪-৫ মাসের বেশী সময় পাওয়া যায় না। কারণ নভেম্বর মাস হতে পানির তাপমাত্র ২০° সে. এর নীচে নেমে যায় এবং এই তাপমাত্রায় গলদার বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে চাষী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি ফেব্রুয়ারী মাসে গলদার ব্রুড সহজ প্রাপ্য করা যায়, তাহলে মার্চের শেষ নাগাদ চাষীদের কাছে পোনা সহজ প্রাপ্য করা যাবে। এতে চাষী বাজারজাত উপযোগী গলদা চিংড়ি তৈরীর জন্য যথেষ্ট সময়ও পাবে। এ লক্ষ্যে, গলদার আগাম ব্রুড উন্নয়নের জন্য ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। দেখা গেছে, গ্রীন হাউজ পদ্ধতিতে শীত মৌসুমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্ক ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।